অধ্যায় ৮ ঃ *জীবনস্মৃতি* — ১

অধ্যায় বিন্যাস

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৮.২ পরিচিতি

৮.৩ গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচয়

৮.৪ *জীবনস্মৃতি* ঃ সাধারণ আলোচনা

৮.৫ ঘর ও বাহির — মূল পাঠ

৮.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

৮.৬ ভৃত্যরাজক তন্ত্র —মূলপাঠ

৮.৬.১ পাঠ বিশ্লেষণ

৮.৭ নানা বিদ্যার আয়োজন— মূলপাঠ

৮.৭.১ পাঠ বিশ্লেষণ

৮.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

৮.৯ অতিরিক্ত গঠন

৮.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

৮.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা জানবেন —

- *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের রচয়িতার জীবন সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন
- রবীন্দ্রনাথের শৈশবে আড়ম্বরহীন জীবন সম্পর্কে জানা যায়
- ঘরের মধ্যে থেকেও মানসিকভাবে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মুক্ত হয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করা যায়
- না চাইতেই সব পেয়ে যায় বলে এখনকার ছেলেমেয়েরা অপব্যায় করে বেশি-এনিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- ভৃত্যদের উপর রবীন্দ্রনাথদের ছেলেবেলার দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাই শাসনের অধিকারও তাদের বেশি ছিল— এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে
- ভৃত্যদের স্বভাব এবং ছেলেদের প্রতি তাদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা যায়
- ঠাকুরবাড়িতে নানা ধরনের বিদ্যার সঙ্গে পরিচয়, যেমন — গান, প্রাকৃতবিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা, বেদবিদ্যা, ইংরেজি শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৮.২ পরিচিতি

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যর অন্তর্গত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতক স্তরে রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথেৰ স্মৃতি কথা নিয়ে আলোচিত, গ্রন্থটিতে নানান অধ্যায়গুলোকে বিভিন্ন নাম দিয়ে সেই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থটির মাত্র ছয়টি অধ্যায় এখানে পাঠ্য হিসেবে গৃহীত।

বর্তমান অধ্যায়ে *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'ঘর ও বাহির', 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' এবং 'নানা বিদ্যারে আয়োজন' সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন। এই তিনটি রচনা অবলম্বণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের নানান স্মৃতিকথার পরিচয় দিয়েছেন। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, ভৃত্যদের শাসনের মাধ্য যে সব স্মৃতিগুলো রয়েছে তা তিনি এর মাধ্যমে প্রকাশ কয়েছেন। এবং একই সঙ্গে ছেলেবেলার নানান ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা সমন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৮.৩ গ্রন্থকার ও গ্রন্থপরিচয়

কলকাতা জোড়সাঁকো ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহন করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ঠাকুর বাড়ির পরিবেশে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত ও অঙ্কন বিষয়েও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম জীবনে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবী বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। ছাপার অক্ষরে স্বনামে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলায় উপহার'। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে তিনি 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'শৈশব সংগীত' ও 'রুদ্রচণ্ড' রচনা করেন, *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভূবনমোহিনী প্রতিভা' তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। *ভারতী* প্রত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' এবং প্রথম উপন্যাস *করুণা* প্রকাশিত হয়। ২২-১২-১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রামের সৃষ্টি হয়। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডর প্রতিবাদে ১৯১৯ এ তিনি তাঁর সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপধি ত্যাগ করেন। এইসময় বিখ্যাত ইংরাজ শিল্পী রোদেনষ্টাইন কবির *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং মে, সিনক্লেয়ায়, এজরা পাউণ্ড ইয়েটস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে এই কাব্য ও কবির পরিচয় করিয়ে দেন। নভেম্বয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে *গীতাঞ্জলি*-র ইংরাজি অনুবাদ বা *Song Offerings* প্রকাশিত হয়। অক্টোবর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের একক চেষ্টায় বাংলা ভাষা সকল দিকে যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান প্রত্যেক বিভাগেই তাঁর অবদান অজস্র এবং অপূর্ব। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ , সুরকার, নাট্য প্রযোজক এবং স্বদেশ প্রেমিক। এমনকি বিজ্ঞানেও তাঁর

অশেষ আগ্রহের পরিচয় পাওয় যায় *বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থে। ভারত ও বাঙলাদেশ এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত রচয়িতারূপে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই নাম পাওয়া যায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ রবীন্দ্রনাথের জন্ম কত খৃষ্টাব্দে হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ রবীন্দ্রনাথ কত খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থটি কবে প্রকাশিত হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ *গীতাঞ্জলি* কাব্যের ইংরাজি অনুবাদটির নাম কী?

.....

৮.৪ *জীবনস্মৃতি*ঃ সাধারণ আলোচনা

জীবনস্মৃতি ১৯১২ রবীন্দ্রনাথের রচিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের পটভূমিকা রয়েছে। এটি শুধু কবির তথ্যসংগত আত্মকথা নয়, এখানে রয়েছে কবিজীবনের উপাদান এবং পটভূমিকা। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের যে সমস্ত রচনায় কবি স্ফুটবাক হতে পারেননি, *জীবনস্মৃতি*তে ব্যাখ্যায় ছলে সেগুলিকে তিনি স্ফুটতর করেছেন। তা ছাড়াও প্রথম জীবনের যে সমস্ত স্মৃতির টুকরো কবির কাব্যজীবনের সহায়ক হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন এতে তারই কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে লেখক তাঁর স্মৃতিগুলোকে কিছু অধ্যায়ের মাধ্যমে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলোর মধ্যে আমাদের পাঠ্য অধ্যায়গুলো হলো— ঘর ও বাহির, ভৃত্যরাজক তন্ত্র, নানা বিদ্যার আয়োজন।

৮.৫ ঘর ও বাহির — মূল পাঠ

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটর উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লাইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্,

অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা— সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো-পরানো সাজানো-গোজানোর স্বারা আমাদের চিত্তকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎ-সামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল, আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম— কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবায় মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম; তাহাতে যাতায়তের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে, পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমাদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহু দূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘূ করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পন করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা-কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পূরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে-তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।

বাহিররাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাই, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা *রামায়ণে* পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীয়ের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বাট — দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম।

সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলেয় উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পন করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য যা উৎসুক; কাহারো বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই- ধীরেসুস্থে স্থান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দূপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুনা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বেয় নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বাটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায় । যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারি দিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারোদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন- কি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বহিয় বলিয়া একটি অনন্ত- প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রুপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জালনার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ

ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে —

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি, আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখি বলে, "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটুবড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূসমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-একদিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপয় কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর ইহতে এই খাঁচায় পাখির সঙ্গে ওই বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম- চোখে পড়িত আমাদের বাড়ি ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধায়ে যে তারা গয়লানী আমাদের দূধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত, তবুচূড়াব সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকাবেরও নানা আগতনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরোদ্রে প্রখর শূভ্রতা বিচ্ছূরিত করিয়া পূর্ব দিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইা চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছ। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রূদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ওই অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাধার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দুরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ম ডাক আসার কানে আসিয়া পৌছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুত নিস্তব্ধ

বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত— তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার তেতালার ঘৰ বন্ধ থাকিত। খড়খড়ি, হাত গলাইয়া ছিটকিনি টানিয়া, দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল— সেইটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যাহ্ন কাটিত। একে তো অনেক দিনের বন্ধ- করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ, সে-ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুখের জনশূন্য খোলা ছাদের উপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে। তখন নূতন মহিমার ঔদর্যে বাঙালিপাড়াতেও তাহার কার্পণ্য শুরু হয় নাই। শহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঁঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য। এক দিকে মুক্তি, আর-এক দিকে বন্ধনের আশঙ্কা, এই দুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পূলকশর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই দুর্লভ থাক্, বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয়তো সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে; ভুলিয়া যায়, অনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে- বাগান ছিল তাহাকে ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি। মঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলিকাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া, এই ঢেঁকিশালাটি কোন্-একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম-মানব আদমেয় স্বর্গেদ্যানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। কারণ, প্রথম-মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন-আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর হইতে যে - পর্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে, সে-পর্যন্ত মানুষের সাজ-সজ্জার প্রয়োজন কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়ির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল-

সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে শরৎ- কালের ভোরবেলায় ঘম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালর- গুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত- তখন শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের ভাইভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ, এখন দিদিয় সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহিরে, তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই, তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজ সেখানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু, একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে, একতলায় বা দোতলায় কোনো-একটা জায়গায়; কিন্তু কোনো মতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে।" সে বলিয়াছে, "না, এই বাড়ির মধ্যেই।" আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে-ঘর তবে কোথায়। রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকুমাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সব চেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কী আছে বলো দেখি।" কোনটা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে, এ কথা মনে করিয়া ভারি বিস্ময় এবং ঔৎসুকা জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। সেটা আতার বীজের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় তৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম— তাহারই মাঝে মাঝে ফুলগাছের চারা পুঁতিয়া সেবার আতিশয্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে, নিতান্তই গাছ বিলয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিত এবং মরিতে বিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কী আনন্দ এবং কী বিস্ময় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্যের সামগ্রী হইবে; সেই বিশ্বাসরে যেদিন পরীক্ষা করিতে গেলাম সেইদিনই আমাদের গুহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালা-সমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল। ইস্কুল-ঘরের কোণে যে পাহাড়সৃষ্টির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রূঢ়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়োই দুঃখ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়োদের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী অকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত — মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি. মনে ভাবিতাম, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া পোঁতা যায়, এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষে আমাদের উঠানের চারি ধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁতিয়া তাহাতে ঝড় টাঙানো হইত। পয়লা মাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটি-কাটা আরম্ভ হইত। সর্বত্রই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। কিন্তু আমার কাছে বিশেষভাবে এই মাটি-কাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বৎসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি— দেখিয়াছিল, গর্ত বড়ো হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্বরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যে কোনোবারই এমন-কিছু দেখা দেয় নাই যাহা কোনো রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুর-যাত্রা সফল করিতে পারে, তবুও প্রত্যেক বারেই আমার মনে হইত, একটা রহস্যসিন্দুকের ডালা খোলা হইতেছে। মনে হইত, যেন আর-একটু খুঁড়িলেই হয়; কিন্তু, বৎসর গেল, সেই আর-একটুকু কোনোবারেই খোঁড়া হইল না। পর্দায় একটুখানি টান দেওয়াই হইল কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত, বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন, তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন- আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া

থাকিত না। আর, যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে-চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধেদয় পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ওই নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সিড়ির উপর সিড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও-না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।" আমি ভাবিলাম, সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "আরো সিঁড়ি আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি"— শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম, এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাঁহারা মাষ্টারমশায় তাঁহারাই কেবল এটা জানেন আর কেহ নয়।

৮.৫.১ পাঠ বিশ্লেষণ

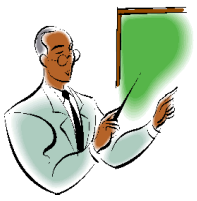
রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিতে তাঁর জীবনের ছেলবেলার কিছু মুহূর্ত এবং কিছু অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন।

ঠাকুরবাড়ির মত বংশে জন্মেও রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল খুব সাধারণ ভাবেই কেটেছে। পরিধান কিম্বা আহারে কোনোরকম আড়ম্বর ছিল না। ছেলেদের প্রতি অভিভাবকদের খুব বেশি নজর থাকত না। ছেলেরা বাড়ির চাকরদের হাতেই বড় হয়ে ওঠত। অভিভাবকদের কড়া শাসনের বন্ধনে জড়িত নাহওয়ায় তারা যেন একরকম মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। অনাদরে লেখকরা স্বাধীনতার কিম্বা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। কারণ খাওয়ানো পরাণো সাজানো-সোজানোর দ্বারা তাদের মনকে চারদিক থেকে আবদ্ধ থাকাতে হয়নি। গুরজনদের অনাদরে তারা নিজের ইচ্ছামত কল্পনার জগত এবং খেলার জগতকে সাজিয়ে নিতে পয়েছিলেন। তাদের জামায় একটা পকেট পর্যন্ত যেখানে তারা খুব সামান্য সম্পত্তিও জামিয়ে রাখতে পারে, সে সময়ে চটি জুতো আড়ম্বরতার প্রতীক হিসেবে ধরা হতো, কিন্তু দেখা যেত ঠাকুরবাড়ির বালকদের কাছে সেটা খেলার সামগ্রি হিসেবে ব্যবহৃত হত। চটি জুতোগুলিকে তারা যেখানে নিক্ষেপ করতেন সেমানে তারা পা দিতেন না। প্রতি পদক্ষেপে চটি জুতোকে আগে আগে রেখে চলতেন ফলে যাতায়াতের সময় তাদের পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনার বাহুল্যতা হতো। জুতার ব্যবহার তাদের কাছে একেবারে ব্যার্থ।

বর্তমান যুগে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই গুরুজনদের থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যায় যা রবীন্দ্রনাথদের পক্ষে দুর্লভ ছিল। না চাইতেই সব সহজেই পেয়ে যায় বলে এখনকার ছেলেমেয়েরা অপব্যায় করে বেশি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেয়ে যায় বলে খুব কম অংশই তারা কাজে লাগায় ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের ভৃত্যরাই দেখাশোনা করতেন। তারা নিজেদের সুবিধায় জন্য বালকদের নড়াচড়া একপ্রকার

বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের একটি ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে তাদের চারিদিকে গণ্ডি কেটে দিতেন। এবং মুখ গম্ভীর কয়ে তর্জনী তুলে বালকদের বলে যেতেন গণ্ডির বাইরে গেলে বিষম বিপদ। ঠাকুরবারিতে শ্যাম নামে এক ভৃত্য ছিল যে দুরন্ত ছেলেমেয়েদের বশ করতে তাদের ঘরবন্দী করে রাখতেন। ঘরের ভিতরে বন্দী থেকেও লেখকদের প্রাণের চাঞ্চল্য বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় কোনোমতেই বাধা পড়ত না। তারা জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে উপভোগ করতেন। লেখক ঘরের ভিতরে বন্দী অবস্থায় থেকে জানালা দিয়ে তাদের বাইরের দিকের পুকুর, পাশের বাগান গাছপালা প্রকৃতিকে অনুভব করতেন। সকাল থেকে পুকুরে প্রতিবেশিদের আনাগোনা, তাদের নিত্ত-নৈমিত্তিক কাজ, ক্রমে দুপুরে শূণ্য পুকুরের নিস্তব্ধতা, সেখানে রাজহাঁসদের বিচরণ গুগলি তুলে খাওয়া, এরপর বহুদিন পুরোণো বটগাছ, তার চারি দিকের ঝুরি ইত্যাদির মাধ্যমে লেখকের মানসচক্ষে দেখা বিভিন্ন কার্যকলাপ চলত। বন্দী ঘরে বসে বাইরের জগৎকে হাল্কা ভাবে দেখার মাধ্যমেই লেখকের কল্পনাশক্তির উদ্ভব হয়েছে। বন্ধনের মধ্যেই যেন তিনি মুক্তির স্বাদ পোয়ছিলেন। আড়ম্বরহীন এবং উপকরণ বিহীন জীবন লেখককে তার কবিত্ব শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে অনেক সাহায্য করেছে।

লেখকরা বাইরের জগতকে খুব কাছের থেকে না পেলেও বাইরের জগতকে মনের দিক থেকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বাইরের উপকরণ বেশি থাকলে সেগুলো নিয়েই হয়তো সময় কেটে যেত, কিন্তু যেহেতু বাইরের উপকরণ কম, তাই মনের দিকটি আর কুড়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মনের কাজ সেখানে আনক বেশি। লেখক মনকে দিয়ে নানান কল্পনা নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন। ঠাকুরবাড়ির যে জায়গাগুলো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে থাকত, সেদিকে লেখকের নজর পড়ত বেশি, কারণ তাতে নিত্য প্রয়োজনের ছাপ থাকত না। কল্পনা এবং শিশুমনের রহস্যময়, জিজ্ঞাসু মন নিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ ঘর ও বাইরের জগতকে এক ছন্দে মিলিয়ে দিয়েছেন। ঘরের গণ্ডী, গুরুজনদের শাসন সবকিছুর মধ্য দিয়ে অপ্রাপ্য, অস্পৃশ্য জিনিসগুলো তিনি কাল্পনিক ভাবে উপলব্ধি করেছেন।



আসুন জেনে নিই...

সীতার গণ্ডি ঃ *রামায়ণে* মারিচ নামে যে মায়াবি রাক্ষস সোনার হরিণ সেজে সীতাকে আকর্ষণ করেছিল, এবং রাম তাকে ধরতে গিয়ে হারিয়ে যায়। লক্ষন সীতাকে কুটিরে একা ফেলে দাদার প্রাণ বাঁচাতে যাওয়ার আগে কুটিরের চারিদিকে এক গণ্ডি কেটে দিয়ে যায় যাতে কোনো অশুভ দৃষ্টি সীতাকে ক্ষতি করতে নাপারে।

গোলাবাড়ি ঃ যেখানে ফসল সংগ্রহ করে রাখা হয়।

রাজারবাড়ি ঃ এটা কোনো রাজার বাড়ি নয়। রবীন্দ্রনাথের এক সঙ্গীর কল্পিত এক ঘর যা ঠাকুর বাড়ির ভেতরই ছিল কিন্তু তা কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মাখোৎসন ঃ এক প্রকার লোক উৎসব।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৫ ঃ 'আহারে আমাদের.....গন্ধও ছিল না।' শূণ্যস্থান পূর্ণ করো।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ ঘর ও বাইরের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে কবি যে কবিতাটি লিখেছিলেন তার প্রথম পংক্তিটি লিখুন।

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ নারিকেলশ্রেণির ফাঁক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন পল্লীর পুকুর দেখতেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ বাড়ির ভিতরে যে বাগান ছিল তাতে যে সব গাছ ছিল তার যেকোনে দুটির নাম লিখুন।

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ বাড়ির উত্তর অংশের একখণ্ড ভূমিকে কবিরা কী বলতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ রাজার বাড়ির আবিস্কর্তা কে?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ 'সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও না...' — বক্তা কে?

.....

৮.৬ ভৃত্যরাজক তন্ত্র — মূল পাঠ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না। আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই-সকল রাজাদের পরিবর্তন বারম্বার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকলতাতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তখন এ-সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনাৰ অবসর পাই নাই— পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম, সংসারের ধর্মই এই — বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায় — শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্‌টা দুষ্ট এবং কোন্‌টা শিষ্ট, ব্যাধ তাহা পাখির দিক হইতে দেখে না, নিজের দিক হইতেই দেখে। সেইজন্য গুলি খাইবার পূর্বেই যে সতর্ক পাখি চীৎকার করিয়া দল ভাগায়, শিকারী

তাহাকে গালি দেয়। মার খাইলে আমরা কাঁদিতাম, প্রহারকর্তা সেটাকে শিষ্টোচিত বলিয়া গণ্য করিত না। বস্তুত, সেটা ভৃত্যরাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন। আমার বেশ মনে আছে, সেই সিডিশন সম্পূর্ণ দমন করিবার জন্য জল রাখিবার বড়ো বড়ো জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হইত। রোদন জিনিসটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অসুবিধাজনক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন এক-একবার ভাবি, ভৃত্যদের হাত ইহতে কেন এমন নির্মম ব্যবহার আমরা পাইতাম। মোটের উপরে উপরে আকারপ্রকারে আমরা যে স্নেহদয়ামায়ার অযোগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটো এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায় — সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু, যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরুহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ানো হয়। যে-বেচারা কাঁধে করে তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে, কিন্তু ঘোড়া-বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই স্মৃতি কেবল কিল চড় আকারেই মনে আছে— তাহার বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে তহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসম্ভব ছিল। এইজন্য এই মৃৎপিণ্ড মেদিনীর মলিতার সঙ্গে সর্বদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিদ্যুদ্‌বেগে ঘটি ডুবাইয়া পুষ্করিণীর তিন-চার হাত নীচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় দুই হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুষ্করিণীর উপরিতলের জল কাটাইতে কাটাইতে, অবশেষে হঠাৎ এক সময় দ্রুতগতিতে ডুব দিয়া লাইত; যেন পুষ্করিণীটিকে কোনোমতে, অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া, ফাঁকি দিয়া মাথা ডুবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময় তাহার দক্ষিণ হস্তটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত যে বেশ বোঝা যাইত, তাহার ডান হাতটা তাহায় শরীরের কাপড় চোপড়গুলোকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেছে না। জলে স্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্যা দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেই গুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্বজগৎটা কোনো দিক দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। অতলস্পর্শ তাহার গাম্ভীর্য ছিল। ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া মন্দ্রস্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিতে। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রায়ই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে, সে বরানগরকে বরাহনগর বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, 'অমুক লোক বসে

আছেন' না বলিয়া সে বলিয়াছিল 'অপেক্ষা করছেন'। তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকালাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুখে 'অপেক্ষা করছেন' কথাটা হাস্যকর নহে। ইহা হইতে দেখা যায়, বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে— এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে; এক দিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্ব গুরুমহাশয় সন্ধ্যাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে আমাদের বসাইয়া সে *রামায়ণ-মাহাভারত* শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরো দুই-চারিটি শ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমারা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল; কৃত্তিবাসেয় সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল — অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো-কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটা ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্যসমাজে পদমর্যাদার সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরুসভায় ভীষ্মপিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আসন বসিয়াও আপন গুরুগৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল।

এই আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ রক্ষকটির যে একটি দুর্বলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অসুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম খাইত। এই কারণে তাহার পুষ্টিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই জন্য আমাদের বরাদ্দ দুধ যখন সে আমাদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিত, তখন সেই দুধ সম্বন্ধে বিপ্রকর্ষণ অপেক্ষা আকর্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল হইয়া উঠিত। আমারা দুধ খাইতে স্বাভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির দায়িত্বপালন উপলক্ষেও সে কোনোদিন দ্বিতীয়বার অনুরোধ বা জবরদস্তি করিত না।

আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সংকোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশ-করা থাকিত। প্রথমে দুই একখানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে-বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মতো, লুচি-

কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেশনকর্তায় কুণ্ঠিত দক্ষিণহস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবায় কিনিবার পয়সা ঈশ্বর পাইত। আমারা কী খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম, সস্তা জিনিস ফরমাশ করিলে সে খুশি হইবে। কখনো মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য, কখনো-বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদাম-ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম। দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

৮.৬.১ পাঠ বিশ্লেষণ

ঠাকুরবাড়ির পরিবারের ন্যায় অভিভাবকদের কাজ ও ছিল প্রচুর, ফলে সন্তানদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ত ভৃত্যদের উপর। লেখক বলেছেন সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড় অসহ্য। পরমাত্মীয়ের কাছে দুর্বহ। ভৃত্যদের রাখা হত লেখকদের দেখাশোনায় জান্য তারা যে শুধুই তাদের উপর অন্যায় অতাচার চালাত তা নয়। তারা তাদের কর্তব্য পালন করত। বাড়ির অভিভাবকরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভৃত্যদের উপর পড়ত। ফলে নিজের সন্তানদের মতো স্নেহমমতা বর্ষণ ততটা থাকত না। পরম-আত্মীয় হলেও সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি হন না। বালকদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের কাজ করতে দিলে সব ঠিক, তা না হলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। বালকদের মন জুগাতে ভৃত্যদের অনিচ্ছা সত্বেও ঘোড়া সাজতে হত। মুজুরির লোভে তারা তাদের কাঁধে করে বেড়াত বটে কিন্তু সুযোগ বুঝে তার প্রতিশোধ নিত। ছোট ছেলেদেয় যদি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী খেলতে দেওয়া হয় তবে কোনো অসুবিধে নেই। যদি কেউ বাধা দেয়, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রায়ই দেখা যেত দুরন্ত বালকদের নিয়ে ভৃত্যরা যখন অসহ্য হয়ে যেত তখন তারা তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করত। দাসরাজত্বের ন্যায় তারা ভৃত্যরাজত্ব শুরু করেছিল। লেখকরা যে সমস্ত দুরন্তপনা করতেন সেটা তাদের কাছ খুব স্বাভাবিক মনে হলেও ভৃত্যদের কাছে ছিল দুষ্টতা। ব্যাধ যখন পাখিকে মারতে উদ্যত হয় তখন যেমন পাখিরা সতর্ক হয়ে চীৎকার কার তার দল ভাগানোকে যেমন দুষ্টতা মনে করে। কিন্তু পাখির দিক থেকে সে নিজের সঙ্গীদের জন্য শিষ্টতারই পরিচয় দিয়েছে তা ব্যাধ বুঝতে পায় না। এই ভৃত্যদের মধ্যে লেখকের একজন ভৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার নাম ছিল ইশ্বর। তিনি পূর্বে গুরুমশায়গিরি করত, সবকিছুতে অত্যন্ত শুচিবাইগ্রস্ত ছিল, পৃথিবীতে তার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটি আর জলের অভাব ছিল। তাই সর্বদা তাদের সঙ্গে লড়াই চলত। পুকুরের জলে তিন চার হাত নীচেকার জল তিনি সংগ্রহ করতেন। স্নানের সময় দুই হাত দিয়ে অনেকক্ষণ পুকুরের উপরের জল

কাটিয়ে হঠাৎ একসময় ডুব দিতেন। চলার সময় তান হাতটি বাঁকিয়ে রাখাতেন যদি তার বস্ত্রে ভুলে কখনো লোগে যায়। কিন্তু তিনি মার্জিত ভাষায় কথা বলতেন। তিনি বাচ্চাছেলেদের শান্ত রাখার একটা উপায় বের করেছিলেন। সন্ধার দিকে তেলের ভাঙা সেজের চার দিকে লেখকদের বসিয়ে *রামায়ণ, মহাভারত* শোনাতেন। এর মাধ্যমে তারা পৌরাণিক বিষয়গুলো এবং কিশোরী চাটুজ্যের অনুপ্রাসের ঝক্ মকিতে ভাষার প্রয়োগকেও তিনি লক্ষ্য করতেন। কোনোদিন পুরাণ পাঠের প্রসঙ্গে শোতৃসভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠলে তিনি বিজ্ঞতার সঙ্গে মীমাংসা করে দিতেন। কিন্তু তার একটা দুর্বলতা ছিল তিনি আফিম খেতেন তাই সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যেরও প্রয়োজন ছিল। তাই দেখা যেত ছেলেরা দুধ খাওয়া নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে দ্বিতীয়বার আর কিছু বলতেন না, তা তখন নিজেই পান করতেন। একইরকম ভাবে অত্যন্ত শুচিতা বাঁচিয়ে ছেলেদের পরিবেশন করতেন যাতে কিছু নিজের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। লেখক বলেছেন শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচারে তার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, লেখকদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।



আসুন জেনে নিই...

দাস রাজত্ব ঃ প্রাচীন কালে দাস রাজারা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার করতেন।

শুচি সংযত ঃ সবকিছুতে যারা শুচিতা বজায় রাখে।

চলতি ও সাধু ভাষা ঃ মুখের ও লিখিত ভাষা।

কুশ-লব ঃ *রামায়ণের* দুটি চরিত্র। তারা রাম-সীতার জমজ সন্তান।

ভীষ্ম পিতামহ ঃ *মহাভারতে* পাণ্ডব-কৌরবদের পিতামহ। কুরুসভায় সকলের নিম্নে থেকেও তিনি গুরু দায়িত্ব ভার রক্ষা করেছিলেন।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১২ ঃ সংসার ধর্মই এই- বড়ো যে সে মারে, ছোট যেসে- .....। (শূণ্যস্থান পূর্ণ করো)

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ 'ঈশ্বর' নামক ভৃত্যটির পূর্ববৃত্তি কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ ঈশ্বর বরানগরকে কী বলত?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ ঈশ্বয় লেখকদের সন্ধাবেলায় সংযত রাখার জন্য কী উপায় বেড় করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ ঈশ্বরের দুর্বলতা কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ "দেখিতাম, শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সুক্ষ্মবিচারে তাহার উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল, আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।"— এখানে কার সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলা হয়েছে?

.....

৮.৭ নানা বিদ্যায় আয়োজন — মূলপাঠ

তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ, শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্ ছিপে বেতের মতো বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত ইঁহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লেংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাষ্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যায় সময় ইংরেজি পড়াইবায় জন্য অঘোর-বাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পয় ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এইজন্যই, জল টগ্‌বগ্ করে — ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প-আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুখ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।

ইহা ছাড়া, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো-এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

ইহারই মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে 'মুকুন্দং

সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন। অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মাস্টার অঘোরাবাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হইতে অগ্নি উদ্‌ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো উদ্‌ভাবন, এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা আলো জ্বালিতে পারে না, এটা টে পাখির বাচ্চাদের পরম সৌভাগ্য, এ কথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে-ভাষা শেখে সেটা প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে, সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজিভাষা নয়, এ কথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার যখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল, সেইসময় শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাস্টারমহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক দ্রুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে। বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধার পূলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টারমহাশয়ের আসিবার সময় দু-চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তরু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সন্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পততে্র বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এমন সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া হা-হতোহস্মি করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে-অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর-কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

যখন সকল কথা স্মরণ করি তখন দেখিতে পাই, অঘোরবারু নিতান্তই যে কঠোর মাস্টারমশাই-জাতের মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। মুখেও যেটুকু তর্জন করিতেন তাহার মধ্যে গর্জনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি যত ভালো- মানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয়ছিল ইংরেজি। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে

হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীরস নহে আমাদের কাছে তাহাই প্রমাণ করিতে অঘোরবাবু একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন; তহার সরসতার উদাহরণ দিবার জন্য, গদ্য কি পদ্য তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইরেজি তিনি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলাম যে সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ দিতে হইল; বুঝিতে পারিলেন, মকন্দমাটি নিতান্ত সহজ নহে- ডিক্রি পাইতে হইলে আরো এমন বছর দশ-পনেরো রীতিমত লড়ালড়ি করিতে হইবে।

মাস্টারমশায় মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণহাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাইব।" এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুষের একটি কঙ্কনলী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরো করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যতবড়ো আশ্চর্য হউক-না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে। তখন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু ম্লান হইল; মাষ্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না। কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে, এই কঙ্কনলীর মধ্যে নাই, দেহব্যবচ্ছেদের কালে মাস্টারমশায় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহার কঙ্কনলীয় ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমত বাজে নাই। তার পরে একদিন তিনি আমাদিগকে মেডিকাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধর মৃতদেহ শয়ান ছিল; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়া ছিল, সে দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপার পড়িয়া থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজিপাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলক্স কোর্স্ অফ বীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপূরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে থাকে-থাকে সার-বাঁধা সিলেব্ল্-ফাঁক-করা বানান-গুলো অ্যাক্সেণ্ট্-চিহ্নের তীক্ষ্ণ। সঙিন উচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজিভাষার এই পাষাণদুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না। মাষ্টারমহাশয় তাঁহার অপর একটি কোন্ সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমাদেৰ প্রত্যহ ধিক্কার দিতেন। এরূপ তুলনামূলক সমালোচনায় সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতি-সঞ্চার হইত না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই

কালা বইটার অন্ধকার অটল থাকিত। প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দয়া কবিয়া দুবোধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাকর্ষণের মোহমন্ত্রটি পড়িয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেমনি পড়া শুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দার দৌড় করাইয়া, কোনো স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন ত'বে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মূহুর্তকাল বিলম্ব হইত না।

৮.৭.১ পাঠ বিশ্লেষণ

'নানা বিদ্যার আয়োজন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথর নানান ধরণের বিদ্যা শিক্ষায় সঙ্গে পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। নর্মাল' স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বড়িতে এসে রবীন্দ্রনাথদের পড়াতেন। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে নানা আনুসঙ্গিক শিক্ষাও তাদের শিখতে হতো। ভোরবেলা উঠে তাদের কুস্তি করতে হতো, তারপর মাটিমাখা গায়ের উপর জামা পরে পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিক শিখতে হতো, রবিবার সকালে গান শিখতে হতো, এছাড়া মাঝে মাঝে সতীনাথ দত্ত মহাশয় এসে যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। লেখকের কাছে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষাটি বিশেষভাবে ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দেওয়ার সময় তাপ সংযোগে পাত্রর নীচের জল পাতলা হয়ে উপয়ে ওঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামাত থাকে যারজন্য জল টগবগ করে। দুধের মাধ্য জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলে দুধ গাঢ় হয়। রবীন্দ্রনাথ এরই মাঝে অস্থিবিদ্যাও শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অস্থিবিদ্যা শিখাত গিয়ে লেখক বাস্তবিক জ্ঞান আরোহন করেছিলেন কারণ তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনে এনে লেখকদের স্কুলে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। চোখের সামান মানুষের হাড়গুলো দেখা তাদের কাছে বিরাট সুখের ছিল। এরপর বোপদেবের সূত্র ও মুখস্ত করতে হতো। এত কিছু শেখার পর বাংলা শিক্ষার পর ইংরেজি শিক্ষাও অর্জন করতে হয়েছিল। ইংরেজি মাষ্টার ছিলেন অঘোরবাবু। তিনি সন্ধ্যার পর পড়াতে আসতেন। একেতে নিরস ভাষা তাও আবার সন্ধ্যার পর যখন শরীর ক্লান্ত হয়ে আসত, তাই দেখা যেত রবীন্দ্রনাথদের একেবারেই পড়ায় মনোযোগ থাকত না।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের স্বাস্থ্যও অত্যন্ত অন্যায়রূপে ভালো ছিল, ফলে ঝড়-বৃষ্টি যাই থাকুক না কেন, তিনি এসে হাজির হতেন। তবে তিনি তাদের সহজভাবে বোঝানোয় চেষ্টা করতেন। কণ্ঠনালীর থেকে আওয়াজ কী ভাবে, বেড় হয়-এর প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর কাছেই। ঘরেই তাদের কঠিন থেকে কঠিন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। এখনকার ছেলেদের বইয়ের মতো সে সময় তাদের বইয়ে ছবি আঁকা থাকত না, ফলে বইয়ের পড়ার প্রতি তাদের আকর্ষণটাও কম থাকত।



আসুন জেনে নিই...

সেজদাদা ঃ রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাকৃতবিজ্ঞান ঃ উদ্ভিদ নিয়ে যে বিজ্ঞান।

অস্থিবিদ্যা ঃ মানুষের হাড় নিয়ে যে বিদ্যা শিক্ষা

ভবভূতি ঃ *রামায়ণের* কাহিনি দিয়ে তিনি *উত্তরচরিত* গ্রন্থটি লিখেছিলেন।



অগ্রগতি নির্ধায়ক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল কোন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ 'মানুষজন্মধারী ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো' বলতে লেখক কাকে বুঝিয়েছেন?

.....

প্রশ্ন নং ২০ ঃ লেখকদের কে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন?

.....

প্রশ্ন নং ২১ ঃ "কিন্তু তিনি যত ভালো। মানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি।" — কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে?

.....

প্রশ্ন নং ২২ ঃ "আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতায় একটি আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাবো।"— এই কথা বলে মাষ্টার মহাশয় লেখকদের কী দেখিয়েছিলেন?

.....



৮.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

- আপনারা রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত তিনটি প্রবন্ধ এখানে পড়েছেন। এই প্রবন্ধগুলো থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কয়েকটি কথা জেনেছেন।
- ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যপরিহত হয়ে থাকতেন। তাদের শাসনে বাইরে যাবার উপায় ও তাঁর ছিল না। জানালা দিয়েই বাইরের জগতকে দেখতেন।
- অবশ্য তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে বসেই যাতে নানা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে সেসব বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন।



৮.৯ অগ্রগতি অতিরিক্ত পঠন

১) চক্রবর্তী, অজিত কুমার; *কাব্যপরিক্রমা*।
২) দাস, শিশির কুমার; *আত্মজীবনী ঃ জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ।*
৩) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার; *রবীন্দ্র পরিক্রমা*।



৮.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৮৬১ সন।
২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৯১৩ সন।
৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৯১২ সন।
৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ Song Offerings.
৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সৌখিনতার।
৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাচাটিতে।
৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সিঙ্গির বাগান।
৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কুলগাছ, বিলাতি আমড়া।
৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গোলাবাড়ি।
১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কবির খেলার সঙ্গিনী।
১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পণ্ডিতমহাশয়।
১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঃ মারখায়।
১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গুরুমশায় গিরি।
১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বরাহনগর।
১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *রামায়ণ* ও *মহাভারত* শোনাতেন।
১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আফিম এর নেশা।
১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঈশ্বর।
১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নর্মাল।
১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয়কে।
২০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সতীনাথ দত্ত।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ইংরেজি শিক্ষক অঘোরবাবু।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মানুষের কণ্ঠনলীর ছবি।



৮.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ "অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা"— রবীন্দ্রনাথ 'ঘর ও বহির' প্রবন্ধে একথা কেন বলেছেন?

প্রশ্ন ২ ঃ লেখকদের দেখাশোনার দায়িত্ব কাদের ওপর ছিল? তারা কী ভাবে বালকদের খেয়াল রাখাতেন?

প্রশ্ন ৩ ঃ লেখকরা চটি জুতায় ব্যবহার কী ভাবে করতেন?

প্রশ্ন ৪ ঃ লেখক তার ঘরের ভেতর থেকে 'বহির' দিকটিকে কীভাবে উপভোগ করতেন?

প্রশ্ন ৫ ঃ "উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুড়ে হইয়া পাড়" — তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ৬ ঃ ভৃত্যরাজক তন্ত্রকে লেখক কোন রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং কেন?

প্রশ্ন ৭ ঃ রবীন্দ্রনাথ 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' প্রবন্ধে দুষ্টতা ও শিষ্টতার পরিচয় কী ভাবে বুঝিয়েছেন?

প্রশ্ন ৮ ঃ "সম্পূর্ণভার জিনিসটা বড় অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষে ও দুর্বহ"— তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন ৯ ঃ ইশ্বর কে? তার শুচি সংযত আচার নিষ্ঠায় পরিচয় দাও।

প্রশ্ন ১০ ঃ রবিবারে রবীন্দ্রনাথদের যে শিক্ষা অর্জন করতে হতো, একটি উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

প্রশ্ন ৫ ঃ অস্থিবিদ্যা শিখতে গিয়ে লেখক কী নিয়ে বাস্তবিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন?

প্রশ্ন ৫ ঃ ইংরেজি শেখার মাষ্টার কে ছিলেন? তার শিক্ষকতার পরিচয় দাও।

*** ***** ***